

প্রথম প্রকাশ
২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
সত্য চৌধুরী
স্বজনী
৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা—৩৭

মুদ্রাকর
মৃগেন্দ্রনাথ মাজী
সৃজনী প্রেস
৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা—৩৭

সূচি

এক টুকরো মেঘ

লিখতে লিখতে কি ভাসমান এক টুকরো মেঘ
দেখে আসা যায়?
উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে হাওয়া, যে আবেগ
তা কিসের তাড়ায়!

ভাবো, অন্ধকার গুহায় যারা ছবি এঁকে রাখ্‌তো ...
সেখানে না কোনো জানালা
না তেমন আলোর কোনো সুবন্দোবস্ত
মিডিয়ার লালসায় নয়, খোলামেলা—

আলোছায়ার বিস্ময়কর এই খেলা!

তোমার নিজস্ব একটা ঘর আছে, ঐখানে আসে আলো!
যেন সূর্য, ঘুমন্ত একটি বড়োসড়ো ফুল—কে ফোটালো!
ঝোড়ো-হাওয়া বারবার দিক বদলায়,
হাজার-হাজার বছর কি তারো আগে যারা আঁকতো—

কোনো দেয়ালও
মাথা তুলে দাঁড়ায়নি! চিত্রীরা ও অশরীরী,
ছবি আজো দৃশ্যমান, সায়
দেয় নিষ্ঠার! সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের ঝিলিক।

এদিক-সেদিক
দিক বদলায়—ঝোড়ো হাওয়া...!

এক নিটোল স্তব্ধতা

দেখি, ঘরোয়া বধূটি এক চিলতে পর্দা সরিয়ে
সরেজমিনে কি যে নিরীক্ষণ করে

দেখি, সুস্পষ্ট কলরবময় বাতাস
(বাতাস তো আর দেখা যায় না!)
দেখি, সাদা-কালো মেঘবিভাজনের মধ্যেকার অবয়ব—
তার ঋজুতা, সুরেলা মধুর ছন্দ, হাল্‌কা নীল ক্যানভাসে
এক বিশাল বেলজিয়ামসদৃশ আয়না
হঠাৎ ভেঙে পড়ে!

তারপর এক নিটোল স্তব্ধতা...!

তর্পণ

লোকান্তরিত পিতৃদেবের সঙ্গে
বেশ খানিকটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের
মুখের
আদল খুঁজে পাওয়া যায়।

এত বেশি এত সহজ সরল
আজকের
পৃথিবীতে—এরকম একজন মানুষকে
খুঁজে পাওয়া যাবে কি না—সন্দেহ!

১৯৭৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি সব ছেড়েছুড়ে
চলে গেলেন! এ বছর স্নান সেরে
জপ-ধ্যানের আসনে বসে
তাঁর মুখ—মন্ত্রের শ্লোকে
হৃদয়ের জাল বোনা . . .

—শিকড় খোঁজা?

যে চ ইহ পিতরো যে চ নেহা
জাংশ্চ বিদ্মং যা উ চণন প্রবিস্ত্র
স্বর্গত পিতা, পূর্বপুরুষরা . . .
যাঁদের আমি চিনি না
সকলকে ঠিকঠাক জানিও না

প্রণাম . . .
প্রণাম, আপনারা আসুন. . .!

যে জীবন অস্তায়মান গোধূলির, যে জীবন রাতের

যে কোনও দিন নিজের গ্রামের—চৌহদ্দির বাহিরে যায়নি—
সেও পৌঁছে যায়, মন কাড়া হাইটেক বিজ্ঞাপন-নিয়ন শোভন-শহরে
—অপ্রাপ্ত বালিকা, কৌতূহলভরে তুমি কার হাত ধরে
বায়ুযানে চড়েছিলে?

জন্ম, এ দেশের অখ্যাত কোনও গাঁয়ে! তুমি তো সেই
গত নয়, আমার এ জন্মেরই নিরুদ্দিষ্ট-বোন;
গ্রামেরও ঝুপড়ি থাকে, সেখানে কর্মহীন, অক্ষম অভিভাবক

দিন গোনে। কখন যে আসবে পরিচিত ডাক পিয়ন!

আমি কি দেখিনি, তোমাদের চকোলেট হাসির আড়ালে
কি নিদারুণ নির্যাতন,
শরীরী-কষ্ট, কান্না
কাকে বলে যৌননিপীড়ন।

তোমার দখল নেয়, তারা কারা? ওগো জীবন, জীবন
কি ঠিক এরকম? বাণ্ডিল-বাণ্ডিল নোট, সে সকলকে
টিকি ধরে করে সম্বোধন।
ওগো, বিদেশি মালিকানা, পুঁজিপতি-পর্যটক, মেঘ না চাইতে
এই জল!

তৃতীয় বিশ্বে, তোমরা নিশ্চয়ই সু-স্বাগতম। এ দেশে কলরোলময়
ব্রেন আছে, আছে সবুজ, আছে সস্তার শ্রম... শুধু আমাদের
গরীবগুর্বো বোনগুলোকে যথেচ্ছ ব্যবহার করো না হে!
আকাশের নিচে তারা নষ্ট হয়ে যায়! সোডিয়াম-ভেপার ল্যাম্পের
আলোর সাধ্য কী তাদের ছোঁয়! ঐ বালিকাটি কি একদিন
ভাবেনি, শক্ত-সমর্থ বৃক্ষের মতো হবে তার বর...
পরিবর্তে, এক শহর ছেড়ে আর এক শহর
থরথর ভাসমান, ছিন্নমূল তার ঘর!

যুবক-যুবতী

পথের ঐ ধার ঘেঁষে—ঐ তো সেই যুবতীটি হেঁটে যায়
আর মাথার আচ্ছাদন নেমে এসেছে মাথার 'পরে

আর এই সেন্ট্রাল পার্ক ঘেঁষে হেঁটে যায় একটি যুবক
যেতে যেতে নিরুত্তাপ, ভাবলেশহীন চোখে তাকায়;

বেড়ানোর পক্ষে এই সেই উপযুক্ত রমণীয় বিকেল
আর পথও বেশ সুনশান, কোন ব্যস্ততা নেই—

কারুর। ওদের দুটি-কে দ্যাখায় এরকমি—
এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, যা নাটকেই মানায়

হাত ধরাধরি! কেন যে হেঁটে যায় না দুটিতে।

ঐ দৃশ্যের অন্ধকারে

মন খারাপের কোনও দিনক্ষণ নেই!

ঐ অন্ধকারে তাকিয়ে থাকি :
শুকনো ডালপালা জড়ো করে
কারা যে লাগিয়েছে আগুন।
কয়েকটি দলছাড়া পায়রা দানা খাচ্ছে
খুঁটে খুঁটে।

স্মৃতি আঁকড়ে কি বেঁচে থাকা যায়?
ঐসব দৃশ্য, ভেঙে টুকরো টুকরো করে
কঠিন এক রুক্ষ বাস্তব...
সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে, এই ভাঙন
সাহায্য করে নিরবধি!

ঐ দৃশ্যের অন্ধকারে
প্রেমিক ও প্রেমিকা আরেক গাঢ় অন্ধকারে
একীভূত হয়ে মিশে যাচ্ছে খুব দ্রুত লয়ে!

কোপাইয়ের জলে

ধীরে ধীরে তখন নামছে সন্ধ্যা
কোপাইয়ের জলে
ঐ নদীর ওপারে—
অ-দূরে
ধানক্ষেতের গাঢ়-অন্ধকারে
টিমটিমে নক্ষত্রের আলো...

মাঝে মাঝে হাইওয়ের বুক চিরে
অটোমোবাইলের যান্ত্রিক আওয়াজ
ভয়াল নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন করে
গুটিকয় সারমেয়র করুণ ডাক
বুকে ভয়ার্ত ঢেউ তোলে

রাত্রি আরও সুতীব্র গভীর হলে
হয়ে ওঠে মায়াময়!

ঝর্নার কাছে মৃতদেহ

ঝর্নার কাছে মৃতদেহ!

খরস্রোতা রামতি নদীর ওপর
ভেসে যায় কতো না মৃতদেহ।

সন্দেহ নয় রে বাপু, সন্দেহ
খালি ব্যাকুলতায়
যদি প্রকৃতি মাথা ঝাঁকায়?

—ঐ ধ্বস্ত এলাকায়!

একদা বসতি ছিল যেখানে
ইতঃস্তত বড় বড়
বেওয়ারিশ পাথর

আজ ওপড়ানো বৃক্ষের অস্তিত্ব সেখানে।

নির্ভরযোগ্য ত্রাণ কোথায়?
ধ্বস নেমেছে পুরো ইয়েবলং এলাকায়

এদিকে ধূ ধূ শ্মশানপ্রায়...

কাঁধে ত্রিপল চালের বস্তা মাথায়
ক্বচিৎ এরকম দু'একজনকে দেখা যায়

ঝর্নার কাছে মৃতদেহ
নাকি, ঐ কিশোর সেও
ঝর্নার কোলে, পরম নিশ্চিন্তে ঘুমায়...

ভুবনগ্রাম

এই রাজনীতি
যেদিন প্রথম পেয়েছিল মানুষেরা—হাতের মুঠোয়!
প্রকৃত অর্থে, সেদিন কি তারা বুঝেছিল
মনোবাসনা ক্ষমতার
ওই সাপলুডো খেলা?
চিরদিন এইখানে এক অপার
ব্যাপ্তির অনুভবে, দিন গুটিয়ে বেলা
যে করুণ অসহায়
পদ্মপাতায়
উড়ু উড়ু সেই মন, আটকে রাখা দায়

—ওদিকে কারও কি পড়েছিল চোখে
ভাঙা কারখানার
শেড, ছাউনি...
গজিয়ে ওঠা ঘাস পায়ের নীচে
মরচে-পড়া চিমনি!
—গেটের ওপাশে ম্রিয়মাণ মুখে,
ওরা কারা?
দেওয়ালময় বিবর্ণ রঙিন পোস্টার!
ভূতগ্রস্তের মতো কথা বলে—ফ্যাসফেসে
স্বরে শীর্ণ ঘাড় নেড়ে হেসে হেসে!
নিজেদের দুর্বলতাকে
বেআব্রু করে রাখে!
তাদের কথায় যুক্তি আছে হয়তো—
কিন্তু বিনয় নেই!
অচলায়তনের দেওয়ালে ধাক্কা-দেওয়া, অবশ্যই
কঠিন-শক্ত কাজ, খুবই!

প্রতিযোগিতা, সর্বত্র ইঁদুর-দৌড়, অধুনা বীজমন্ত্র...
কে কাকে ল্যাং-মেরে

এগিয়ে যাবে। মনে হয়, ছিল দ্বেষ সৃষ্টির ভিতরে-
প্রথমত

—এতকাল কোথায় যে রয়েছিলাম?

ধরা যাক, এই পৃথিবীর আরেক নাম
ভুবনগ্রাম!

অস্থির ভিতরে ভিতরে

সারা গলফ গ্রীনে-ই রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া!
যৌবন গরবে ডগমগ করে!
নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে, ঐরকম অন্য কাউকে
দেখিনি তেমন!

শালিখের ঝাঁক, কোকিলের ডাকও শোনা
যায়! কে জানে, কোন সবুজ প্রবীণ বৃক্ষের
আড়ালে অমন আকুলভাবে সে ডাক দিয়ে ফেরে!
মাঝে মাঝে দলবদ্ধ টিয়াদেরও উড়ে যেতে—

দেখেছি! দুতিনটে চড়ুই একেবারে অন্দরে সেঁধিয়ে
দারুণ হুজ্জত বাধাতে চায়! কলকাতার পাখিও
কম যায় না। জানালার শার্সি খুলতে সামান্য বিলম্ব
হলে ঠুকঠুক করে জানান দিতে চায়, 'এবার উঠে পড়ো'

উঠে পড়ি, হাঁটি চক্রাকারে। সেন্ট্রাল পার্ক কেন্দ্র করে!
লক্ষ করি :
রাধাচূড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, অস্থির ভিতরে ভিতরে,
কৃষ্ণচূড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, অস্থির ভিতরে ভিতরে...

আত্মার মর্মেই আছে

এক রেনিগেডের সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি
হল! আজই। যৌবনের প্রতিটি
মুহূর্ত প্রতিবাদী?
তার এক অন্যতর গূঢ় অর্থও আছে

আক্ষরিক অর্থে, ঐ অবসরভোগির সঙ্গে
একদা ছিল খুব দহরম-মহরম।
এখন তার ধোঁয়াটে রকমসকম
শুরু করেছে সবাই টের পেতে

ঐ হ্যাঁ মুখ,
সারিবন্দী বাঁধান দাঁত
চুলে কলপ...
জুলফি রেখেছে—সাদা! থপথপ
করে হাঁটে। চ্যাংড়াদের সঙ্গে চ্যাংড়ামি
স্পষ্ট দেখতে থাকি, এই আমি
যেন অনুড্ডীন পাখি...

সব সময় ঐ মুখে কি যে খেলা
চলে—খোদায় মালুম!
আত্মার মর্মেই আছে
এক গাঢ় বিষাদ...।

সুন্দরের অপেক্ষায়

লাখো গুজব, মুণ্ডু রাবণের বহুধা বিস্তৃত হয়ে
বিপরীত বাতাসের দিকে তীব্র বেগে ধায়,
একে মহিলা, তদোপরি নিয়মিত সাঙ্গপাঙ্গসমেত—
চালাতেন শিধুপান ও শেয়ারব্যবসা
—ভাবা যায়?

জীবন নয় হে, অতোই সোজা বা মসৃণ পথে
নিছক এক খাসা।
পুরুষরাজ, পুরুষ জমানায়,
যারা নানান ছলছুতোয় ছোঁক ছোঁক করে।
নেই নিস্তার,
যদি একবার
হড়কায় পা, বিশেষত যদি হন তিনি মহিলাসুন্দরী।

থাকে ধান্দা, প্রায় সকলেরই সুযোগমাত্র, এসো ছিন্ন করি।
যে জীবন ছিলো, হয়তো বা সুন্দরের অপেক্ষায়
একটানা ঠায়! এই কবি তাকে, খুঁজিবে কোথায়।
—তবে, সে কি আত্মহনন?
—কি সেই পুঞ্জীভূত দহন?

হাতে ফোরেন সিগারেটের প্যাকেট, সেই মধ্যবয়সিনী
স্থাপত্য, নিঃসঙ্গ একাকিনী
ঝাঁপিয়ে পড়তোই যতো সব মাংসের সন্ধানী।

এসব ঘটনা কবেকার... জান কি তা? যখন এই কবি, হায়
বসে লিখেছিলেন আরেক যুগের অন্নদামঙ্গল
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার 'মেঘ-আলাপ' কানে
এসে যখন ধাক্কায়।

অথবা ভাবো
ঐ সেই মহিলা হাঁটুর শাড়ি তুলে যাচ্ছেন হেঁটে—
তার দু'চোখে অশ্রুর কুয়াশা কেবল...

জল

রাজনীতি ছাপিয়ে দলমত নির্বিশেষে তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ
চায় জল!
গাঁ-গেরামে যা সোনার চেয়েও দামী!
জলস্তর অভিমানে নামতে নামতে নেমে গেছে
অতল পাতালে!
কারা সব তেতে আগুন;
কাদের পাতে জোটে না নুন!
চোখে পড়ে, পথের দু'ধারে
কাতারে কাতারে
বালতি হাতে বহু মানুষের সুদীর্ঘ লাইন...

গ্রামের কোন সুদূর প্রান্তে কারা যেন ঠিক
রটিয়ে দেয় 'আর্সেনিক'... 'ডাইন'
বিস্তীর্ণ জনপদ এখন শুখা...
উত্থান ঘটে যায় অন্ধকারের
যে জগতের.
পথ আঁকাবাঁকা!

মিনারেল ওয়াটারের বিলাসিতা নয়·
গ্রামগঞ্জ চায়, গলা ভেজানোর
তৃষ্ণা মেটানোর জল।

নাথ পবনসুত

আকাশে ভাসে দু'চারটে মাস্তান-মেঘ
পাটভাঙা দুধ-শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি
অঙ্গে চড়াবে কী, ভাবো?

— কে কাকে বাঁচায়
— কে কাকে নাচায়, দুদিনের এই খাঁচায়!
ব্যাকুল হয়ে ডাকলে-ই পাবে—
তার সাড়া পাবো?

'নাথ পবনসুত' যশরাজের গলায়—
যে আবেগময় ভক্তি
ঝরে পড়ে! 'একটু দাঁড়াও, ওগো—' ঐ সুরে
নিজেকে হারাবো!

ধর্মান্তর পর্ব

ঐখানে আলোয় ধূসর অন্ধকারে
মা সিংহবাহিনীর গেরুয়া মন্দিরে
হোমযজ্ঞের লেলিহান অগ্নি...
পুণ্যাতুর লোভী হাতে, ধান্যশস্য ছিটিয়ে

অসহায়-মূক আদিবাসীদের নিয়ে
শুদ্ধিকরণ চলে—চল্‌তেই থাকে
পেটভরে, মাড়ভাত দেওয়ার কেউ নেই হে
এ পৃথিবীতে

আছেন তালে সবাই ধর্মান্তরকরণে।

নিরাশ্রয় কতিপয় মানুষের অন্তর্ধানে,
দিনে দিনে
সে কোন স্বর্গের সিঁড়ি?
যতোদিন এ পৃথিবীতে রয়েছে জীবন—
ভুখা-শরীরী—

হয়ে রক্তচক্ষু ধর্ম, কেবলি তড়পায়।
—এ কোন ধর্ম? রয়েছে যেথায়
মানুষ ব্যথিত, নিঃসহায়

এমন সর্বনেশে শান্তি আর কোথায়!

বন্যা ১৪০৭

অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র পানীয় জলের দাবিতে
সরোষে বিক্ষোভ দেখায়
দলবদ্ধ ঐ বানভাসিরা!
মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি
এই বিক্ষিপ্ত অনর্গল বৃষ্টি, বাঁচার উপায়
—কোন পথে?

ত্রাণের চিড়েমুড়ি
যাওয়াবা আসে ছিটে ফোঁটা!
'মরতে যখন হবে মরব সেই গাঁয়ে'
জলের পরে মাচা বেঁধে সংসার, অন্তত বাঁচার চেষ্টা
অথচ, কাজিয়া এমন পর্যায়ে
সেই দলবাজি, সর্ষের ভিতরে ভূত, একচক্ষু নীতি
প্রশাসনের

ক্ষুধার্ত মানুষজন থালা হাতে—ত্রাণের
আশায়! চারদিকে জল আর বিধ্বংসী জল
পরপর গ্রামের
কোনও ঘরের চাল পর্যন্ত দেখা যায় না আর।

স্রেফ জেগে আছে কয়েকটি গাছের মাথা
বিধ্বংসী এই জলের ভিতরে উঁকি দিচ্ছে পানকৌড়ির
মত এক একটি বাড়ির কংকাল! সর্বনাশের
দশদশা! অবশিষ্ট বলতে কিছুই নেই আর
না ত্রাণ, না ওষুধ, না ডাক্তার ...

আর এরই মধ্যে কে বা কারা আগামী নির্বাচনের
ঘুঁটি সাজিয়ে যায়!

রিমোট কন্ট্রোল

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'

রিমোট কন্ট্রোল, পাশবশক্তির ওই ভাবপ্রচারের
অর্থ কী?
বিস্ফোরণের পিছনে রয়ে যায়
অগণিত মানুষের হাহাকার; বিধবার অশ্রুপাত,
অনাথের ক্রন্দন...

ওই হিংস্রতা
কী হেতু?
বাতাস কোনদিকে বহমান লক্ষ্য করো
জীবনের মূল স্রোত কোন পথে, এ সাদা
গভীর সত্য একজন সাধারণেও জানে!

বিপ্লবী তুমি,
যাও—মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে

'মরিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা
ধ্রুব সত্য কিছুই নাই; তবে...... কোনো মহৎ
সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করো না কেন?'

প্রমাণ করো, 'এ জীবন বলিপ্রদত্ত!'

জঙ্গলে

আমরা জঙ্গলে
বাস করি---
বাবা-আ
জঙ্গলে।

অশীতিপর বৃদ্ধার
নড়বড়ে বেঁকে যাওয়া ঘাড়
সোজা করতে-করতে, তার
সর্বাঙ্গ এক হয়ে
কথা বলে।

অভিযোগ-অভিযোগ
আর অভিযোগ,
গ্রামীণ মানুষদের
ঐ এক রোগ।

ব্যাখ্যা, ঐ কোতোয়ালি-কর্তার:
দলবাজি, মারপিট, দাঙ্গার—
আপনারা 'টাউনের'
মানুষ, বোঝেন না—এসব ঠিক
টনটনে সম্মান আছে পাড়া-গাঁর—
মেয়েদের।
একটু এদিক-ওদিক
কিছু বেচাল হলে
ধর্ষণ
ওরা বলে।

'না-না-ধর্ষণ হয়নি।

বর্ষণ— ?

না-না-বর্ষণ হয়নি।'
এটা স্রেফ গ্রামীণ
উত্তেজক
প-লি-টি-ক-স।

তাতো বুঝলুম,
না হয় দু'চোখে দেখিনি;
তবু, সর্বত্রই ধায়
কেন অহরহ—নিচু গলায়
ফিসফিস! ফিসফিস!

জলে-স্থলে
আর্সেনিক, বিষ ...
পানীয় জলে বিষ...।

নির্বাচনে, হাজার কোটি টাকা..
বাঁচব না কি আমরা—
ঐ রাজত্ব পর্যন্ত, ধেত্তেরিকা!

কে বা কারা

দেখি, ভেড়ার পালকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়
কে বা কারা!

দেখি, গেরুয়া-সবুজ রক্তিম বর্ণের—
প্রায় সব ঝাণ্ডাধারিরা
পরিস্থিতিও নিজ নিজ মত অনুযায়ী
নিতে চায়
আশ্রয়, নৃশংস হিংসার!

দেখি, গ্রামের ঐ কচি শিশু, ধানচারা,
মাটির বাড়ি পুড়িয়ে যায়
তারাই বা কারা?
দলবদ্ধ ও দলছুট মিছিল আছে
সন্ত্রাসতাড়িত তীব্র ভাঙচুর আছে...

রক্ত ঝরে, কেবলি রক্ত ঝরে
গ্রাম-মফস্‌সল ও এ শহরে

প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করে পথচারীরা
রাস্তার দু'ধারে দোকানের সাটার
ঝটপট নামিয়ে দেয়, তারাই বা কারা?

সেটাই এখন লক্ষ্য করার।

সর্বত্র, একের পর এক নিষ্ঠুর হত্যার
ঐ দলীয় সংঘর্ষ, শেষপর্যন্ত কোথায়
কোন পথে নিয়ে যায়!

হয়েছিল যা, ঠিক তাই

হিংসা না, প্রতিহিংসা সব জ্বলে পুড়ে মরে!

ওরা কারা? তুমিও চেনো ওদের
আর চিনি আমিও সেই তাদের
দেখেছি, দিনভর রাস্তায় ওরা গুলতানি করে।
আর না হয় হিড়িক দেয় আওয়াজ দেয়—
এইভাবে সময় কাটায়,
গ্রাম ছেড়ে চলে আসে ভীড়ভাট্টা এই শহরে!
'যেমন তেমন কিছু একটা চাই, পেট চালাবার—
মতো...!' —চাকরি? সে-তো সুঁচ খোঁজা, খড়ের গাদায়...।

তাতে কী, হাত-পা রয়েছে চরে খাও, চরে;
লক্ষ কর, দলবল নিয়ে কারা ঢুকছে এলাকায়!
লক্ষ কর, কারা হানা দেয় রাখি-পূর্ণিমার সন্ধ্যায়
কোনও কথা কাটাকাটি—এমন কী তর্কবিতর্কও নয়
বোঝা যায় কারা রয়েছে এখনও সক্রিয়
বোঝা যায় এ বঙ্গেও যে কোনও ছুতোয় যে কোনও সময়
হতে পারে ওড়িশার হাটে— কেওনঝরের মনোহরপুকুরে—
হয়েছিল যা, ঠিক তাই ঘটে যেতে পারে
হা রে-রে-রে-রে....!

রণবীর সেনা

ভোজপুর জেলায়
সাহারা থানায়
বাথানিটোলায়
এসবি ঘটেছিল, গত সন্ধ্যায়!

গিয়েছিল দেখা, কাদের?
শক্ত ঘাঁটি তাদের
পোষা রণবীর সেনার
অচানক দুর্বার হানায়

সাঙ্গ হল ভবলীলা
তাতে কার
কি-ই বা এসে যায়!

—ওরা কি খুব, মাথাভারি—
ভোটার?
তবে, মাথাওয়ালাদেরও
যিনি মাথা

তিনি-ই বা করতে পারেন কি?
কিই বা আছে করার!

বাথানিটোলায় হাহাকার!

জোয়ার-ভাটা

বলা হয়েছিল, এক সময় যে, কৃষকরাই বিপ্লবের আগুন
ছড়িয়ে দেবে দিকে দিকে
এখন শোনান হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণী... শ্রমিক শ্রেণী...

কলে ও কারখানার গেটে ভারি-তালা ঝোলে!
—কে আসে ঐ মার্জার পদক্ষেপে,
—সে কি প্রমোটারের থাবা?

চির সবুজ ঘাস কি কংক্রিটের ধুলি থেকে
বাঁচাতে সক্ষম হবে, নিজেকে?
প্রগতিবাদী কথাবার্তা সব টিভির ক্যামেরা—
সাক্ষী রেখে!

জানালার গা-ঘেঁষে প্রাণের আনন্দে
যে পাখি গান গায়
তার দৃষ্টি ফেরায়

তার দিকে চেয়ে ভাবি,
সেও কি ফিরে আসেনি—
বিবর্তনের নিয়ম মেনে

তাবৎ প্রকৃতি, বিশ্বের যত গ্রহেরা
তারাও শাশ্বত নিয়ম মেনে চলে

যদি নক্ষত্র নাই থাকে
তবে কোথায়, সেই জোয়ার-ভাটার
—গ্রহ-নক্ষত্রেরা?

আর আমরাই বা কোথায়।

শিকড়ের প্রাণ

হাত তোলা, কথায় কথায় ঘাড় নাড়া
এই সব কৌশল
তোমার ঠিক আয়ত্ত হল না, আজও

কতোখানি নত হলে পাওয়া যায়—কতোটুকু
রোমাঞ্চকর—এই ছল
বহমান অন্ধকার এই স্রোতের জঠরে, একটি
চতুর মাছও

দেখি, ঘোরে ফেরে আলগা উল্লাসে—
ভাসে

যেন সুখের সপ্তম স্বর্গে
নামবে না আর কোনদিন এই ধরায়—মর্ত্যে।

বরং, এক পা এগিয়ে, দু'পা পিছিয়ে
বিম্ব থেকে প্রতিবিম্বে কোনও শর্তে—
নয়, অন্তর-তাগিদে খোঁজেও

নিজের স্বতন্ত্র পরিচয়, যাতে আছে শিকড়ের প্রাণ।

এই দল, ঐ দল

বুঝতে পারি না, ভাব? সব দুর্যোগেরই
নিবিড় ও গূঢ় অর্থ আছে! বদ্ধ, জমে থাকা জল থেকে
বেরোচ্ছে পচা গন্ধ, ভ্যাপসা! — 'জল পান না করে
কতক্ষণ থাকবে?'
—তৃষ্ণার্ত এই-ই সব মানুষ? বিচ্ছিন্ন সড়ক, আরও অবনতি
বন্যা পরিস্থিতির! যেন বন্যারই
হঠাৎ উথলে ওঠে প্রেম, বা অপত্য স্নেহ! ছিন্নমূল শ্রীহীন
অলক্ষ্মীর দশা।...
বন্যা দুর্গতদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার
পরিবর্তে, জননেতার সফরের মহড়া দিচ্ছে হেলিকপ্টার!
পেয়েছে এই দুর্যোগে দারুণ মওকা—জনসেবার
জীবন্মৃত এই দল, ঐ দল...!

জলের শব্দ

...মাটির তলায় জলস্তর দ্রুত নামছে।
ভয়নক-দিন আসছে ...,

শুরু হয়ে গিয়েছে চাপান উতোর। সবাই তাকিয়ে
ভবিষ্যতের দিকে। ঘটমান বর্তমানের প্রতি কেউ
কি তাকাব না আমরা? স্রেফ, ভ্রুকুঞ্চিত? বেরিয়ে

পড়ি ঊষালগ্নে। তৃষ্ণার দাস, অনাবৃষ্টি, খরা, ঢেউ
পাশাপাশি। চাহিদার ২.৪০ শতাংশ জলের প্রয়োজন
ঘর-
গৃহস্থালির!
এই সামান্য জল
কি পৌঁছেছে গ্রামে গ্রামান্তরে?
খরা আর বন্যা এ দেশের পরম সঙ্গী।
অথচ ভূগর্ভের
কোলে অপর্যাপ্ত জল। বিপদজ্ঞাপক সাইরেন বেজে
চলেছে ঐ দূর দূর গ্রামগুলির শিয়রে!
জলাশয়,
না জলসঞ্চয়?

মানুষের বুকের ভেতর
চোখের কোনায় চিকচিক করে
অশ্রুজল।
আমি শুনি কেবলই জলের শব্দ...!

ইঁদুর

শুয়ে শুয়ে আমি লক্ষ্য করি,
একটি ইঁদুর সন্তর্পণে যায়,
আসে!
আমি চিনে ফেলি তাকে
সেও কি আমাকে লক্ষ্য
করে? ঠিকঠাক চেনে?

তার অহংকারী চোখে
আমি চোখ রাখি;
সহাস্যে এবার বলি:
'তুমি তো ইঁদুর!'

সে খানিক গম্ভীর হয়ে বলে:
'যাকে-তাকে—
বলো না ওরকম!'

এ শহরে দোরে দোরে

খুব সকালে যদি ভাঙে ঘুম, ঘাড় ঘুরিয়ে
শালিখ জোড়ার একটিকেও
কি দেখা গেল?
—সৌজন্যসাক্ষাৎ? ঘুমিয়ে
পড়ল নাকি, আজ?
—দিগভ্রান্ত? —ওরা কি কাকেদের
টানা আধিপত্যের বিরুদ্ধে
দাঁড়াতে শিখেছে, মুখোমুখি রুখেছে আজ?
এই বলিয়ে কইয়ে যুগে,
—কে তবে, জাঁহাবাজ?

—এ বয়সে কাকে বলে, সুস্থির নীরবতা?
তার সন্ধান পেতে চেয়ে
দস্তুরমতো ঝরাতে হবে ঘাম, আজ!

—আজও? সর্বত্র ক্ষমতা আর ক্ষমতা!
এ শহরে দোরে দোরে, ঘুরে ঘুরে হতক্লান্ত, বিপর্যস্ত
কাৎ হয়ে ডুবে যাচ্ছে, সাহসী মাথা—উঁচু জাহাজ।

আগুনের অক্ষর

এই টাইগার হিলেও হয়
নিশ্চিত সূর্যোদয়!
মৃত্যু, ঐ ধ্বংস ঐ ঝড়ের
ভিতরে দাঁড়িয়ে, ক্ষয়া খপ্পুরে—
সেই কবির বুক ভেঙে গিয়েছে বেদনায়!

এই সীমান্তে চলেছে তুলকালাম লড়াই
অনুপ্রবেশকারী প্রতিবেশী এক দেশ—
অথচ দু'দেশেরই নাই
প্রয়োজনীয় খাদ্য— পানীয়—শিক্ষা... আশঙ্কার
কারণে ঐ গনগনে আগুনের গোলা, স্তূপাকার—
মৃত্যু, ছাই!

কারা মুখে জয়ের চিহ্ন এঁকে ঘুরে বেড়ায়?
এই যে অগুনতি সৈন্য চিরতরে হারিয়ে যায়
আমি তাদের আর্তস্বর, হাহাকার শুনতে পাই
কানে এসে ভাসে তাদের পরিবার পরিজনের সুতীব্র কান্না..

ওগো, পরিকল্পিত যুদ্ধবাজ নেতা, ব্যবসায়ী—
অই আগুনের অক্ষর—
কি তোমাদের ছোঁয়? গ্রাম শহর
সবুজ ক্ষেত, স্বপ্নের ঘর
এক একটি জীবন পোড়া কাঠ অবশেষে

হারিয়ে যায় লতাগুল্মের ভেতর ঝিঁঝিপোকার ডাক
দিন রাত লেসার নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র, নৃশংস ভাষায়
কথা বলে,
কোটি কোটি ডলার-পাউণ্ড-ইউরোর মারণাস্ত্র
প্রতিযোগিতা চলে
হায়না ও নেকড়ের ক্রুর-হাসি, প্রকাশ্যে বেচাকেনা;
হায়! আমরা সেই জ্ঞানপাপী, সবকিছু দেখেও দেখি না।

একুশ শতাব্দী

একুশ শতাব্দী
এই অব্দি
লিখে মনে হল পৃথিবীর গূঢ় পয়মন্ত অসুখে
মানুষ এবার হবে কি পরমতসহিষ্ণু? স্থির এসব মনে রেখে
একা একা হেঁটে যেতে হবে কি সক্ষম?

চিত্রগুপ্তের খাতা খুলে মেলাতে চাইবে কৃষ্ণবর্ণ যম?
ঐ সব যুদ্ধবাজ ওরাং-ওটাংসদৃশ নেতারা
কেন নির্বাচনে উন্মুখ? কেন ভোট বল্গা-হারা?

যে পাখি লুটিয়ে পড়ে গুলি খেয়ে
শূন্যে মৃত্যু, তার ভবিতব্য? আমি এই সব জটিল বিস্ময়ে
সমাধান পাইনিকো খুঁজে আজও। বহু পথ চলা হল

একুশ শতাব্দী? তবে কি, আমাদের সময় ফুরাল?

আরেক কলকাতা

কি কপাল! কি কপাল! যে কিছু মহা সৌভাগ্যবান কুবের
রয়ে গিয়েছেন—এই কলকাতায়, এই শহরে!
ওঁদের হয়তো বাণিজ্য ব্যাপারে বছরের অধিকাংশ মাস
থাকতে হয় ট্যুরে, কখনও একা, কখনো স-পরিবারে!
তবু এ শহরে তাঁদের জন্য আছে
গা ছমছমে স্বপ্নিল এক 'পশ' এলাকা!
ওখানে সবকিছুই 'গাড়ী আস্তে চালান' 'হর্ণ বাজানো নিষেধ'...

অফিস এলাকার ভয়ংকরতম শ্বাসরোধকারী-দূষণ
এখানে নেই
নেই কোনো বিপ্লবী হু-হুংকার!
কলকাতার ভিতরে বিস্ময়কর আর এক কলকাতা!
এদিককার গাছ-গাছালির শাখা-প্রশাখার ফাঁকে রোদ এসে
ছায়ার সঙ্গে কাটাকুটি খেলে যায়।

—কাদের ঘুম ভাঙে? ফোলা ফোলা কাদের ঘুমন্ত মুখগুলি?
ওরা যেন ঠিক এ শহরের কেউ নয়! দুদিনের জন্য এসেছে
বেড়াতে!
হে শহর, সমিল পয়ারের মতো নিখুঁত জীবন আমার নয়!
— হে শহর, আমায় তুমি ফিরিয়ে দেবে?

এখানে রুক্ষ-মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে মিনিবাস—
দৌড়ায় না কখনও
তবু কেন, এইসব এলাকাকে আমার কবরপুর বলে মনে হয়?
কি এক আকর্ষণে এখানে আমি হেঁটে গিয়েছি বারবার!

ঐ সব মহা সৌভাগ্যবানদের অন্দর ও বারমহল থেকে
কখনও কি শোনা গিয়েছে কোনো চিৎকৃত, কথালাপ?
কেউ দেখেছে আমার মতো রোদের আঁচল খসে গিয়ে
রোদের লজ্জা হোলো, রোদ নূপুর হোলো, ঝর্না হোলো
তারপর? সব অগোছালো! এলোমেলো—

বৃথাই, সেই পাখিটি ডেকেই গেলো!

বন্দিজীবন যারা যাপন করেন, তাদের কি কখনও
কেউ হেসে উঠতে দেখেছেন স-জোরে
না শোনা যায় এখানে শিশুর কান্না
না শাঁখের আওয়াজ চীৎকার-চেঁচামেচিতে
যে প্রাণের স্পন্দন বোঝায়
তাও বা কোথায়!

সু-সজ্জিত ঐসব খিলানযুক্ত প্রাসাদগুলি যেন
নৈঃশব্দ্যের কাচে ঢাকা
জানলা কি বারান্দা টপকে
এক চিলতে-আলো মুখ থুবড়ে পড়ে রাস্তায়!

প্রাচুর্য প্রাচুর্য আর প্রাচুর্য
এই পৃথিবীর শহরে যেখানে যতো বেশি প্রাচুর্য
সেখানে সাইক্রিয়াট্রিস্টদের ততো রমরমা।
সেখানে ততো বেশি ডিভোর্স রেপ, মার্ডার...
আর বৃদ্ধাবাস ঠিক
সুইসাইড ততোধিক!

আমি ও আমরা যারা জীবনকে বারোটা বাজানোর দিকে তেরো পা এগিয়ে
আমি ও আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বে, ঠিকমতো খেতে পাই না
শিক্ষা নেই আলো নেই একঘরে গাদাগাদি
কেটেছে শৈশব, তবু আকাশ জয়ের দুরন্ত বাসনা
প্রাণভরে সবুজ নিঃশ্বাস রয়ে গিয়েছে সুদূর নক্ষত্রে
আমি ও আমরা যারা ঠিক মৃত নয়, তবে মুমূর্ষু!
আমি ও আমরা যারা অবাক হয়ে শুনি, কি যন্ত্রণা!

প্রাচুর্য, তুমি এতোই বেহুঁশ
বোধ হয় এসব নিন্দুকের রটনা!

লিখে রাখি

গ্লানি ও পরাজয়ে
আধাআধি এ জীবন আমার
আজও বিস্ময়ে

জানালার পাশে
মাঝরাতে উঠে
থুতনিতে ভর অনস্পষ্ট

রুপালি-জ্যোৎস্না
মাথা খুঁড়ে মরে

এ সবি আজ লিখে রাখি!

স্বৈরিণী

লিখি এ কবিতা, তবে আর কার জন্য?
দিনের পরে দিন চলে যায়
পাখি আমার পাখি, ওরে বন্য
তোর যে ডাক দিগন্তের সুদূর সীমায়...

এখানে ঘাসের সবুজ-জাজিমে
পা তোলা পা ফেলার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ
দুঃসাহসের সঙ্গিনী সে—নিটোল ঘুমে
যেতো তলিয়ে! বেসুরের গলায় সুর মন্দ

আবার ভালোও। তবে একি ক্ষণিক মুহূর্তের উচ্ছ্বাস?
তোমার চোখে ওগো আমার গরবিনী—
আজন্ম সেই লালিত এক তীব্র সর্বনাশ।

কে জানে সে কতো সুন্দরী স্বৈরিণী।

আবু রোড আর মাউন্টআবু

আবু রোড আর মাউন্ট আবু— কিন্তু, এক নয়!
তার ধারণাও ছিল কিঞ্চিৎ ধোঁয়াটে
আবু পাহাড়ের সীমানার দিকে
সুতীক্ষ্ণ-চোখ রাখা মেঘের দল
জয়সলমীর ছাড়িয়ে প্রতিবেশী পাকিস্তানের
সীমানা ছাড়িয়ে
উড়ে যায়,
কোথায় যে যায়!

মেঘ, ও মেঘের দল তোমাদের ভিসা-পাশপোর্ট
বিনা, উড়ে যাওয়ায়
কোনো বিধিনিষেধ নেই।
তার ক্ষেত্রে এসব দুরাশা—সেই
দিকের আকাশ স্থির; স্বপ্নে শুধু দেখেছি সূর্যোদয়!

আপাতত সে চোখ ফেরায়
পানিহারীর দিকে
অবাক চোখে তাকায়
কলসির উপর কলসি বসিয়ে
গদীসর সরোবর থেকে সারি সারি রাজস্থানী
নারীদের ধীর লয়ে জল বয়ে নিয়ে

আসা, এক বুক তৃষ্ণায়—
তার সর্বাঙ্গ পিপাসিত হয়ে ওঠে!

জলের প্রহার

যেন এই সব নদীর আরেক নাম প্লাবন, বন্যা...

কলরোলময় উত্তাল স্রোত, এইসব বানভাসি
দুর্গত মানুষেরা চোখের জল মুছে দেখছে কেউ—
ধ্বংসের ভয়াল-চেহারা
আকাশ-চিরে কার ধারালো হাসি?
— সশব্দ বজ্র-ঘোষণা!
বাঁধ-পলির জেরে সবকিছু জেরবার
হিংস্র-নদীর স্রোত, এই প্লাবন বছর বছর—বারবার

লক্ষ্য করে সে: বানভাসিরা জলের প্রহার
সহ্য করে মুখ বুজে! আর গণতন্ত্রের প্রহরীরা
নিদ্রা যায় পরম সুখে। এইসব দুর্গত-মানুষেরা—
দু'চোখে তাদের কেবলি ঘন আঁধার;

কেবলি শিয়রে কাল শমন, দুর্ভাবনা...।

ঐ দূরে কোথাও

সঙ্গী না পাওয়ায়—মনোমত সঙ্গী না পাওয়ার
বেদনায়
দুঃখিত মানুষ—প্রেমিক মানুষ নেশার

দিকে হাত বাড়ায়!

অজানা-ভুল, বিপদ-ভয়, অসন্তোষের পারদ
তাকে ঘুরিয়ে মারে দিনভর
একটা ঘোরের ভিতর—

যে ভাবে এতোকাল 'দুনিয়াদারি' দেখে এসেছে
তবু—হতশ্বাসে ন্যুব্জ, শতাব্দীর অপমান
মুছতে চেয়ে তার বিষণ্ণতা, আমি টের পাই

দেখি, পড়ন্ত-আলোয় সেই অবনত মুখ
অভিমানে, না প্রার্থনায়?

ঐ দূরে কোথাও
রক্তিম-সূর্য ডুবে যায়!

মৃত্যু-কে

মৃত্যু-কে বিশ্বাস নেই এ বয়সে।

যখন-তখন দিতে পারে হানা
কি বিপুল বিক্রমে অসম সাহসে;
পরোয়া করে না কাউকে, ঠিক এমনি ধূসর ডানা,
ডাকাবুকো।

ছোঁয় না যম খক খক কাশির এ বৃদ্ধকে
অথচ মা ঠাকুমার কোল থেকে তুলে নেয় স্বচ্ছন্দে
দুধের শিশু! দ্যাখো, সেই বৃদ্ধটি পরম আনন্দে
'গুড়ক, গুড়ক' শব্দে
টেনে যান হুঁকো!

মৃত্যু-কে বিশ্বাস নেই?
যেদিন গেছে একেবারেই কি গেছে, সেই
সব সব কিছু প্রাকৃত বিদ্বেষে!

একবার দু'বার তার খোঁপায়
ফাঁস থেকে পাওয়া গিয়েছে রেহাই
এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে তার
বড়ো মায়া? বড়ো ভয়? ও কার
বজরা? গার্হস্থ্য ধর্মে ছিল মতি স্থির
অস্থির
দুপায়ে হেঁটে যেতে পারে সে কতোদূর আর?
তবে, আজ তার দু'চোখে নিদ্রা নাই...

কেবলি শূন্যতা

দুপুরের ঠা-ঠা রৌদ্রে কেবলি শূন্যতা
নেই কোথাও কোনও পাখি
সেই গগনবিহারী চিল আকাশ খাঁ খাঁ
তবু কোথায় যে উড়ে যায়,
কোন সুদূর নীহারিকায়
কিভাবে তাকে আকুল স্বরে ডাকি?

ও আকাশে ওড়া পাখি,
আমাকে কি চেনো?
ছন্নছাড়া আমি স্বপ্নে সুখী
ঝোড়ো বাতাস, তুমি—
কেন যে পিছু টানো!

ভয়

ভয়াল-যতদিন যায় তত কালো ভয়
গ্রাস করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে

হুড়ম-দুড়ুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভয়
বয়স্ক শরীরে ঠাণ্ডা লাগার ভয়

চলমান ষাঁড়, দ্রুতগামী লরি
ছিঁচকে-কুচো মাস্তানকে ভয়

ভয় রাস্তার কুত্তা, হাতে বালা
মাস্তান, সুদখোর কাবুলি, নেতা

রাজনৈতিক অভিনেতা, ভরদুপুরের ক্যুরিয়ার
সজোরে কলিংবেল বাজানো

টেলিফোনের রিংটোন যখন তখন!
জরা-ব্যাধি এহো বাহ্য

সেই নিজেকেও কে না ভয় পায়
ও সাঁই অব মোরে নাঙ্গিয়া পার করো.. !

পোখরান

তাহার আছে
নিশ্চিত পোখরান!
চাঘা— কেবল—
তাহার আছে—
বাহু-শক্তির প্রমাণ!

—ছিল ভূ-গহ্বরে জমা?
একটি নয়
দুটি নয়

পাঁচ-পাঁচটি বোমা!

প্রশ্ন একটাই, কে দেবে
ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন
নির্ভেজাল পানীয়?

এই কবিতার পংক্তি
কি কোথাও পৌঁছবে?
একের ভিতর অন্য—
কোনও বাস্তবে?
সেই অমূল্য প্রাণ
যা অদ্বিতীয়!

যে জীবন ঘাসের
নদীর কিনারে;
শুয়ে থাকে যে ছন্দোবদ্ধ
বে-পরোয়া মনে পড়ে

—তবে, ও কোন দল?
পেটে ভাত দেওয়ার কেউ নয়;

রিরংসা তীব্র অন্যায় মৃত্যু
জেনো, আঁধারেও উজ্জ্বল!
যারা শুধু চেয়েছিল বাঁচবার পথ...
পরিবর্তে, শুধুই আতঙ্ক কেবলি
নিরবচ্ছিন্ন ভয়!

আগুনমুখো

বাস পোড়ান?—ট্রাম জ্বালান?
—ত পোড়াবেন?
তবে কি কথায় কথায় বন্‌ধ
এই তোমার প্রতিবাদের ভাষা?

বাসের কাচে থানইট ছোঁড়া?
হিংসাত্মক আগুনমুখো হঠকারিতা
স্পষ্ট ভাষায় কিছু বল,

দুজনার মধ্যে
সে কে, যে—
এই দূরত্ব গড়ে দিল!

—বঙ্গপ্রদেশে আজ আর কেউ নেই?
কবি একা অসহায়

গুমরে মরে
ভিতরে-ভিতরে!

আকাশ চাওয়া পাখি

দুপুরের ঠা-ঠা রৌদ্রে, কেবলি শূন্যতা
নেই কোথাও কোনও পাখি
কেমাত্র গগনবিহারি চিল ঐ কোথায়
যে উড়ে যায়! কোন সুদূর নীহারিকায়
উন্মত্ত ব্যাকুল স্বরে ডাকে . . .
'ওরে, কোথা যাস?'

আকাশ চাওয়া পাখি, হয়ত-বা সে
চেনে তাকেও অল্পবিস্তর জানে!
কৃষ্ণচূড়ার মাথায় এখনও রৌদ্রাভা লেগে আছে!

নিগৃহীতা

সন্তান—কখনও যদি কেঁদে ওঠে?
মা, দৌড়ে এসে, চোখের জল মুছিয়ে
খাবার তুলে দেন সেই ক্ষুধার্ত-সন্তানের মুখে!

কিন্তু, ঐ মা নিগৃহীতা হওয়ার সময়?
এক্‌-দু'জন নয়
পরপর ষোলজন নরাধমের নারকীয় উল্লাস

যখন চলতেই থাকে—
তখন এই আমরা কি করছিলাম?

নির্বাক তাকিয়েছিল সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ
দারুণ ভাবে সব অর্থে বিপর্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে
নিগৃহীতা হচ্ছিলেন, ঐ মা!

বুকে হাত রেখে বলুন—
তখন এই আমরা কি করছিলাম?

—আমরা বলতে ঠিক কাদের বোঝায়?
—ভীতু, উদাসীন, ধান্দাবাজ, তার্কিক, স্বার্থপর,
আর উত্তেজনাপ্রবণ...?

সমাজবিরোধীদের মুখে দুরাগত-আওয়াজ
শোনামাত্র—
ঝটপট দরজা-জানলা বন্ধ করে জোর-ভ্যলুমে—

ভিডিও দেখ্‌ছিলাম কি?

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!
ধিক আপনাদের! গণতন্ত্রের কুপুত্ররা আজো—

জামার কলার উঁচিয়ে
কোতোয়ালদের—চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়!

ভীত-সন্ত্রস্ত পাখির ঝাঁক ক্রমাগত উড়ে উড়ে
আরক্ত আকাশের কাছে স-কাতর প্রার্থনা জানায়!

কেঁদে কোনো লাভ নেই, মা।
যার টাকা নেই, পেশীবহুল কানেকশান নেই
দুঃসময়ে তার পাশে কেউ এসে দাঁড়ায় না!

আর কিশোর? তুই একটা রাসকেল। ভয়ে-সিঁটিয়ে
কেঁদে সমস্যার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হয়েছে?
তার চেয়ে ক্যারাটে শেখো

যখন যারা পাওয়ারে, সেই দলে ভিড়ে যাও!

ওগো কাঙাল

এই গ্রীষ্মে হাহাকার দাবানল তুমি কার—
আর্তনাদ শোনো ?
এ কি তবে মুহূর্তের ক্ষয়, পরিণাম যার

অপেক্ষা তুমি—
দিন গোনো !

বিকেল গড়িয়ে গেলে লাফিয়ে নামে আঁধার..
'ওগো কাঙাল, আমায় করেছ কাঙাল...'

ঐতিহ্য

মাস্তুলবিহীন দিশাহীন জাহাজ
যেন এ দেশ
—ঘৃণা ঝরে পড়ে অবিরল
না, অবরুদ্ধ

লক্ষ্য করি: অভিমান...! দিকে দিকে জানালাগুলি রুদ্ধ
দরজাও ভেজানো!
—একি তবে, প্রতীকি তাৎপর্য?
—কোন পথে, মুশকিল আসান?

ধীরে ধীরে ফিরে আসে
ধুনুচি নাচের ঐতিহ্য
মাছি তাড়ায় বাউল একতারা হাতে!

নেকড়ের পাল

স্পষ্ট চোখ মেলে দ্যাখো ঃ একবার নিজের দিকে
বিশ্বাস রাখো
বিশ্বাস। অখণ্ড বিশ্বাস...

বিশ্বাস কি এক সু-গভীর অর্থে
আত্মবিশ্বাস নয়
এ জীবন কেবলি করে ওঠে হাঁসফাস!

তাকাই যেদিকে, শুধুই বিজ্ঞাপন
হোর্ডিং
দেওয়াল লিখন আর—

পথের প্রতিটি মোড়ে
ফেনা-তোলা জ্বালাময়ী লেকচার।
সর্বত্র সেই ছুঁচ আর চালুনির গপ্পো...

রাগসঙ্গীতে— আলাপ থেকে
ঝালায় ওঠার মতো

ক্ষমতা মোহগ্রস্তরা চায় তার
ছিট-তালুক অবিরত
বজায় থাক্...

সিগারেটে ধোঁয়ার-বৃত্ত উড়িয়ে
ভাবি, সন্ধ্যা-সকাল
মনে মনে আজো, খেঁকশিয়ালরা ঠাওরায়

তারাই নেকড়ের পাল!

পথ

পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ!

বুঝি পথেরও স্রষ্টা আছে

পাহাড়চূড়া থেকে নেমেছিলো
যে অফুরান জলরাশি—
এই সমতলে,

সে কার নির্দেশে স্তব্ধ হয়ে আছে!

ছিন্ন তাঁবু

চাঁদকে ধীর লয়ে একটু একটু করে
ঢেকে দিচ্ছে চিরচেনা এই পৃথিবী!

ঠাসাঠাসি ভিড়ে
ভিড়াক্কার
ছিন্ন-তাঁবু জোড়াতাপ্পি...

—তোমার দৈন্যদশা
তবু ঘুচল কই?
ছন্দ-মিল আর
অক্ষরবৃত্ত,
মাত্রাবৃত্ত
নিয়ে নিরবধি তোমার
ডানা ঝাপটানো!

আজও কতদূর? মই—

কিচিরমিচির কিচিরমিচির
করে শালিখ ও চড়ুই...

ভাসমান বাতাসে
দেখি, কেলি করে জুঁই।

এই রাতে

শুনসান এই রাতে, তার সামনে আর নেই কোনও পথ
পাড়াগাঁর গভীর রাতের মত নীরব
শুধু দু'একটি শীতার্ত কুকুর
প্রাণসংশয়, ডেকে যায়।

বিড়ালের মুখে দেখি
ক্রূর চতুর হাসি।

বারোমাস

বৈ শা খ

দারুণ অগ্নিবাণে
এ যাত্রায় আমি বেঁচে যাই রবীন্দ্রনাথের গানে!

জ্যৈ ষ্ঠ

জ্যৈষ্ঠ, সে তো পিপাসার ঋতু
ঘামাচি, একটানা দুঃখ ও মশার ঝাঁক—

এ শহরে কোথায় বা ধুনো, কোথায় ধুনুচি!

আ ষা ঢ়

জানালার শিক, দু'হাতে ধরে দাঁড়াই
শূন্য এ চেয়ার
বিবর্ণ-আকাশ ভেঙ্গে কান্না সে কার

নেমে আসে—এরই নাম ছিঁচ-কাদুনে আষাঢ়!

শ্রা ব ণ

এক ব্যর্থ-কবির জন্ম মাস, সে কথা কি জানে মন!

ভা দ্র

এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর
এ ভাদ্রে তুমি কি ছিলে কাতর!

আ শ্বি ন

আশ্বিন
এক একদিন সেই দগ্ধ মানুষটা ঘুমায় সারাদিন!

কা র্ত্তি ক

কার্ত্তিক
আজো লিখ্‌লি না ধারাবাহিক ধিক— তোকে ধিক!

অ গ্র হা য় ণ

তোমাকে কে তাড়া করে ফেরে? নিয়তি, অগ্রহায়ণ
আরো কতো দুঃখ দেবে? সুখ, সে তো ক্ষণিকের
ঝরে যায়, ঝরে পড়ে হেমন্তের পাতার মতন!

পৌ ষ

কী চাও আমার কাছে? জলে
ও কার শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভেসে যায়
এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে কে চায়!

সমগ্রভাবে তার বেঁচে-থাকা ছলে বলে কৌশলে।

মা ঘ

খ্যাতিকে খ্যাতি খায়
সহাস্যে আমি দেখো যাবো
তাকে টেনে নামাবো—
সে আমি নয় কালাকাল
কালের অধিক ঐ মহাকাল

ভেসে যাবে জীর্ণ ঝরাপাতা, পথের ধুলায়।

ফা ল্গু ন

ফাল্গুন লেগেছে বনে বনে
এ শহরে কোথায় বন
ফালি-বারান্দায়— মাটির টবে ফোটে রক্ত-জবা...

সেই, আ-জো গেল না তোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা!

চৈ ত্র

চৈত্রের ঝরাপাতা— মর্মে, না মেধায়?
স্পর্শের অতীত
ঐ মৃত্যু একদিন এসে দাঁড়াবে
ধীরপায়ে তোমার দরোজায়!

বাঁচব

ঠিক আর ক'বছর বাঁচব? জানি না আমি,
সত্যই জানি না।

এর আগেভাগে দু'দুবার ধাক্কা দরোজায় ধাক্কা
খেয়ে ফিরে গিয়েছে সে। আর কি সময়
দেবেন তিনি, ঐ আকাশের ওপারে
যার বসবাস, সেই পরম করুণাময়।

বাজারে যাওয়ার রাস্তায় তরমুজের পাহাড়।
সবুজ ও কালো রঙের আঙুর, মুসুম্বি, ছোট-বড়
সাইজের বেল, শশা-গাজর-টমাটোর ছড়াছড়ি।
পার্সে টাটকা অফুরন্ত না হলেও আছে। থাকে।

মাছও কত রকমের।
কুলিটাউন এ শহরও এখন মহাস্ফূর্তির
জায়গা।— কে বা কারা দিয়েছে মোচ্ছবের বায়না...
গুরগুর করে ওঠে মেঘ, বুকের মধ্যে নিরবধি চাপা কষ্ট

চোখ ছলছল কান্না কি মানায়?
না, মানায় না!

সেলাই মেশিনের

সেলাই মেশিনের নিডলের মত বারবার
যাওয়া-আসা
তোমার ভালবাসা!
এভাবেই নুয়ে বুনে চলো গোচরে
মনোরম উর্ণজাল,
দ্বিধাবিভক্তের মাঝ বরাবর সুকৌশলে
মুড়ে দাও জীবন।

মৃত্যুকে পশ্চাতে ঠেলে
এভাবেই রচনা কর ফ্যামিলি!
তফাৎ টানো
রঙিন-সুদৃশ্য পর্দায়
মেলেছো তোমার জাল
ঘূর্ণায়মান পাথর সংসারে
গজিয়ে ওঠে জনে জনে এবারে মূর্খও স্থূল সুখ
শান্তির পারাবার
শুধু তুমি বিদায় নেওয়ার আগে খুলে যায়
খসে পড়ে এ জীবনের জোড়!
কিশোরীর ত্বক ও সৌন্দর্যের মত—
তোমার রহস্য গোপন ছলাকলা
থাকে, সবি থাকে। সদ্যঃস্ফুট বীজের ভিতরেও
দেখি আর নবতর এক প্রগাঢ় ভালোবাসা!

ঐ বৃহৎ দেশটি

ঐ বৃহৎ-দেশটি দাম্ভিক উন্মত্ত ক্ষমতা-পাগল।
এসব নিয়ে ভারাক্রান্ত মগজ, আর ঘামিও না হে
নাছোড়, ফালতু তার দাদাগিরিই একদিন না একদিন
দু'চোখের ঘুম কেড়ে নেবে! আবহাওয়া রয়েছে
কোন মাত্রায় থমথমে

ওয়ার্ল্ড-ট্রেড-সেন্টার ভেঙে পড়ল হুড়মুড়। কোনও দিন
ভেবেছিলে কি? ধুরন্ধর গোয়েন্দা বাহিনীও ফ্লপ।
প্রয়োজন, তলিয়ে চিন্তা করার
থোড়াই কেয়ার
বে-পরোয়া সন্ত্রাসীর মারণ-খেলা কবে যে বন্ধ হবে!
—আদৌ হবে কি?
মশা-মাছির মত সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে!

কী ভয়ংকর, নির্মম ইতিহাস
মৃত্যু, রগ ঘেঁষে ছুটে যেতে চায়। ত্রাস
যেন বা রয়েছে ওৎ-পেতে।
সর্বত্র, বিবস্ত্র রাজনীতি। অন্ধকারাচ্ছন্ন চতুর্দিকে

মুষলধারে অবিরাম বৃষ্টি ও বজ্রপাতের শব্দ...।